পুরস্কার

BanglaBook.org

বয়স্ক চব্বিশ। লম্বা, রোগাটে। হাত-পা রোগা, মুখখানা শীর্ণ, পরেটের দশা আরও কাহিল। লোকটি একজন শিল্পী।

গল্পের সূচনায় তাকে তেপায়া একটি চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। যে-ভাবে বসে আছে, তাতে মনে হয়, নড়াচড়া করবার উদ্যমটুকু পর্যন্ত নেই। ঠোঁট থেকে খুবই বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে একটা আধ-খাওয়া সিগারেট। হাতে একখানা বই। লোকটির তাবৎ মনোযোগ মনে হচ্ছে ওই বইখানাতেই নিবদ্ধ।

এই যে দৃশ্য, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু কারও চোখে পড়বে না। একটু নজর করে দেখলে অবশ্য ভিন্ন কথা। তখন যা দেখা যাবে, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। বইখানা উলটো করে ধরা।

এইভাবে কি বই পড়া যায় নাকি ? কী ব্যাখ্যা এর ? ব্যাখ্যা আর কিছুই নয়, লোকটি আদৌ পড়ছে না। এমন কী, বইয়ের দিকে চোখই নেই তার। আসলে, যাকে 'মাঝামাঝি দূরত্ব' বলা যায়, সেই রকমের একটা ব্যবধান থেকে লোকটি ওই বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে মাত্র। চোখের দৃষ্টি শূন্য। তার মানে লোকটি কিছু ভাবছে। সত্যি তা-ই। ওর মাথায় রয়েছে একটি প্রদর্শনীর চিন্তা।

আজ সকালেই কাগজে বেরিয়েছে এই প্রদর্শনীর খবর। এবারকার চারুকলা প্রদর্শনী নাকি এত বড় আকারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, আর মিডিয়াম বা মাধ্যম ব্যবহারের ব্যাপারেও কোনও বিধিনিষেধ নেই, শিল্পী ওটা বেছে নিতে পারবেন তাঁর আপন ইচ্ছা অনুযায়ী। এই প্রদর্শনীর এ-দুটোই হচ্ছে মস্ত বৈশিষ্ট্য। এর ফলে শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভার পরিচয় একেবারে অবাধে দিতে পারবেন।

প্রদর্শনীর এই যে বিজ্ঞপ্তি, এটা নিয়েই এখন ভাবছেন আমাদের শিল্পী। ছাপার অক্ষরে যা কিনা একেবারেই ঠাণ্ডা ও নেহাতই একটা খবর মাত্র, তা-ই তাকে আলোড়িত, উত্তেজিত করে তুলেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ সে ত ধৈর্য ধরে এই রকম একটা সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিল। তুলির ব্যবহারে তার দক্ষতা যে কতখানি, সে চাইছিল যে, লোকে সেটা জানুক, তাকে কিছুটা স্বীকৃতি দিক। সেই স্বীকৃতি পাবার এই হচ্ছে

একমাত্র সুযোগ। নিজের প্রতিভা সম্পর্কে কোনও অলীক ধারণা তার একেবারেই নেই। প্রদর্শনীতে বেশ মোটা অঙ্কের যে-সব নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে, সে-সবের কোনওটাই যে সে পাবে, এমন কথা সে কল্পনাও করে না ; তার কাজের জন্য উদ্যোক্তাদের একটা প্রশংসাপত্র পেলেই সে খুশি হয়ে যায়। তাও যে পাবে, এমন ভরসা তার নেই। কিন্তু তবু সে চাইছে যে, প্রদর্শনীতে তার ছবি টাঙানো হোক, লোকে তার কাজ দেখুক।

তা ছাড়া, ভিতরে-ভিতরে একটা আশা যে নেই, তাও হয়তো নয়। বলা ত যায় না, শিল্প-প্রদর্শনী নিয়ে কাগজে-কাগজে যে-সব লেখা বেরোয়, তাতে তার কাজের একটা উল্লেখ হয়তো থাকতেও পারে। কোনও সমালোচক হয়তো লিখতেও পারেন, "শ্রী—এর 'আ ফ্যামিলি গ্রুপ' চিত্রখানির আবেদনও কম নয়। তাঁর কম্পোজিশন চিত্তাকর্ষক, রঙের নির্বাচনেও বেশ মুনশিয়ানার ছাপ রয়েছে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শরীরে আলস্য, হাতের মধ্যে উলটে-ধরা বই, লোকটি এখন চিন্তামগ্ন। কী হবে তার ছবির বিষয়বস্তু, তা-ই নিয়ে সে ভাবছে।

শিল্পের ব্যাপারে যদি তার কোনও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থেকেই থাকে, ত বলব যে, সে রিয়্যালিজ়ম বা বাস্তবতার অনুরাগী। যা বাস্তব,

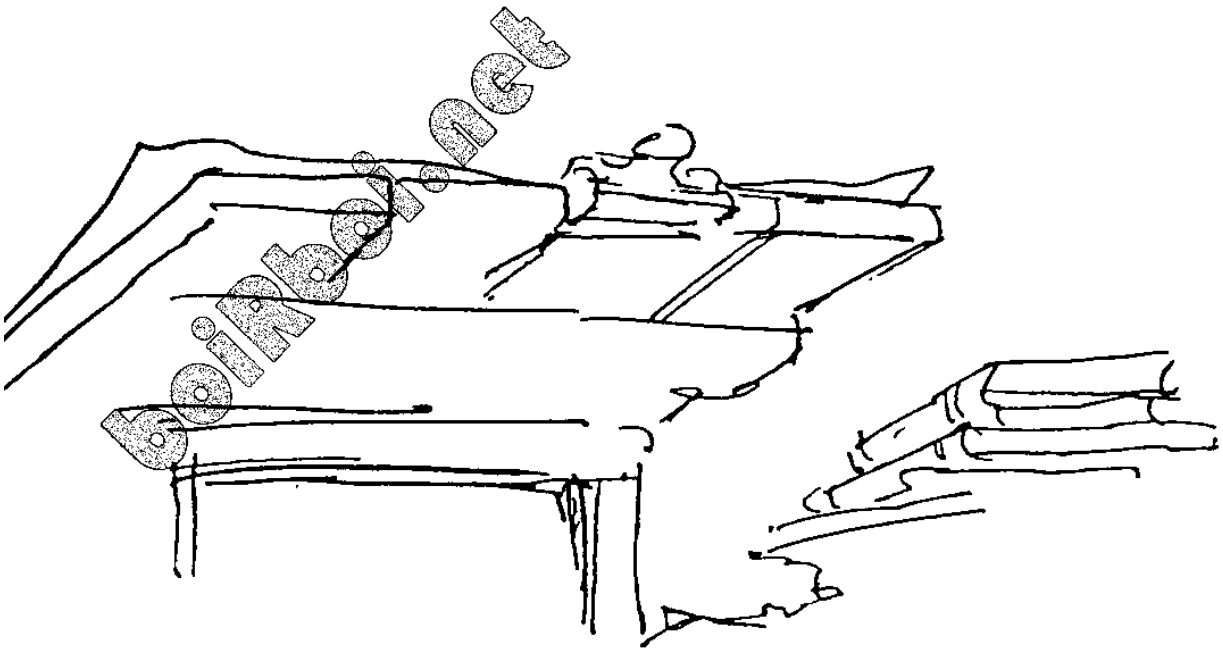

তার সঙ্গে সে একেবারে আঠার মতো সেঁটে থাকে। প্রকৃতিকে ভেঙেচুরে বিকৃত করে দেখানোই ত আধুনিক শিল্পের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তার সৌন্দর্যবোধ তাতে পীড়িত হয়। শিল্পে যা স্যারিয়ালিজ্‌ম বা অধিবাস্তববাদ বলে চলছে, তা তার ভীতি উদ্রেক করে। তা ছাড়া, রেখা আর আকৃতি নিয়ে ওই যে-সব পাগলামির খেলা, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যাবস্ট্র্যাকশন' বা বিমূর্ত শিল্প, ওটা তার মনে আদৌ কোনও সাড়া জাগায় না। তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই শিল্প নিয়ে বড়-বড় সব কথা বলে। তাদের কেউ-বা শখের সমালোচক, কেউ-বা নিজেই চিত্রশিল্পী। তারা তার সংকীর্ণ মনোভাবের নিন্দা করে বলে, "তোমার কথা শুনলে হাসি পায় হে!" বলে, "ওই সব বস্তাপচা পুরনো ধারণা নিয়ে আর চলবে না। আধুনিক শিল্পীদের কাজগুলো সব ভাল করে দ্যাখো, তার তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করো। এটা তোমাকে করতেই হবে, না-করে উপায় নেই। এই যে সব জিনিয়াস, এঁদের তুমি উপেক্ষা করবে কী করে?" বলেই তারা একগাদা নাম আউড়ে যায়। খটোমটো সব নাম। শুনে তার কান ঝাঁঝাঁ করতে থাকে। কিন্তু মতের কোনও বদল ঘটে না।

আধুনিক শিল্পকলার উপরে যে-সব বই রয়েছে, তা যে সে কখনও পড়ে দেখবার চেষ্টা করেনি, তা নয়। চেষ্টা করেছে একাধিকবার। কিন্তু

সেই বইগুলির মধ্যে যে-সব ছবি রয়েছে, তা এতই কিম্ভূত ঠেকেছে তার কাছে যে, পড়া আর এগোয়নি। এইরকম একটা ছবির কথা মনে পড়ছে তার। ছবিখানা দেখে মনে হয়েছিল, কাঁচা হাতে কেউ নিআনডারথাল বা পুরোপলীয় যুগের এমন এক আদি মানবীর ছবি এঁকেছে, যার সম্ভবত গোদ হয়ে থাকবে, সেইসঙ্গে যার গলাটা একেবারে জিরাফের মতো লম্বা। অথচ সেই ছবির নাম কী দেওয়া হয়েছে ? না 'আদর্শ নারী'। ভাবা যায় ? তার মনে হয়েছিল, এর চেয়ে অদ্ভুত রসিকতা আর কিছুই হতে পারে না।

পরদিনই সে ছবি আঁকতে লেগে যায়। ওয়াটার কালারে সে সিদ্ধহস্ত। এটাও সে ওয়াটার কালারেই আঁকবে। ছবির বিষয়বস্তু কী হবে, অনেক ভেবেচিন্তে আগের দিন সন্ধ্যাতেই সে তা ঠিক করে ফেলেছিল। শেক্সপিয়রের নাটকের যে-সব দৃশ্য তার প্রিয়, এটা হবে তারই একটির চিত্ররূপ। ঘুমন্ত অবস্থায় লেডি ম্যাকবেথ হাঁটছেন, এই হবে তার ছবি। ছবির নাম দেবে 'দ্য সমন্যামবুলিস্ট'। অর্থাৎ 'স্বপনচারিণী'।

ছবি আঁকার ব্যাপারে এখনকার মতো উৎসাহ সে এর আগে কখনও পায়নি। আলাদা একটা কাগজের উপর তুলি দিয়ে হরেক রং মেলাতে-মেলাতে সে দেখে নিচ্ছে যে, ঠিক কোন্ কোন্ রঙের মিশ্রণ তার ছবির পক্ষে জুতসই হবে। রঙের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাবার পরে সে আসল কাজে হাত দিল। এটা যে তার একটা সেরা ছবি হবে, তাতে তার সন্দেহ নেই।

ছবিটা শেষ করতে মোট দশ দিন সময় লাগল। নোংরা, মলিন, ছোট্ট যে ঘরখানিকে সে তার স্টুডিয়ো হিসেবে ব্যবহার করে, এর মধ্যে সেই ঘর ছেড়ে তাকে বড়-একটা বেরোতে দেখা যায়নি। এই প্রথম সে তার মনপ্রাণ একেবারে ঢেলে দিয়েছে একটা ছবির মধ্যে। যে ধৈর্য আর উদ্যম নিয়ে সে এঁকেছে এই ছবি, তার মতো ঢিলেঢালা আর অগোছালো প্রকৃতির মানুষের পক্ষে সেটাকে একটু অস্বাভাবিকই বলতে হবে।

ছবির কাজ মোটামুটি হয়ে যাবার পরেও তো এখানে-ওখানে একটু-আধটু তুলির ছোঁয়া লাগাতেই হয়। সেটা শেষ হল পাঁচই জানুয়ারি তারিখে। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। তুলি রেখে সে টানটান করে হাত ছড়িয়ে দিল। কাজের উত্তেজনায় দপদপ করছে তার পেশিগুলি। তারা এখন বিশ্রাম চায়।

একটু বাদেই, কাজটা কেমন হয়েছে, ঠিকমতো সেটা বুঝে নেবার

জন্যে, কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সে তার ছবির দিকে তাকাল।

তাকিয়ে রইল পুরো পাঁচ মিনিট। চোখ দুটি আধবোজা, মাথাটা একপাশে একটু হেলানো। ছবিখানিকে যত দ্যাখে, ততই ভাল লেগে যায়। রং, অভিব্যক্তি, কম্পোজিশন, সবই সাক্ষ্য দিচ্ছে সেই প্রেরণার, ভিতরে যার তাগিদ ছিল বলেই এই ছবিখানি সে এইভাবে আঁকতে পেরেছে।

হঠাৎই তার মনে হল যে, নিজেকেই সে অতিক্রম করে এসেছে। যা সে তার চোখের সামনে দেখছে, তেমন ছবি যে সে আঁকতে পারবে, নিজের সম্পর্কে এমন ধারণাই ত তার ছিল না। এখন সে দারুণ তৃপ্ত। সে বুঝতে পারছে যে, দশ দিন ধরে এই যে এত পরিশ্রম করেছে সে, জলে যায়নি।

কিন্তু নিজের সৃষ্টি নিয়ে আত্মতৃপ্ত হয়ে বসে থাকবার মতো সময় ত নেই। প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাবার আজই শেষ দিন। আজ রাত্তিরেই সে তার ছবি ডাকে পাঠিয়ে দেবে। নিজের ছবিতে সে যা দেখেছে, সমালোচকদেরও সেটা দেখা চাই। আসলে তাদের দেখাটাই তো বেশি জরুরি।

ইজেল থেকে ছবিখানা সে নামিয়ে রাখল। তারপর খোঁজে লেগে গেল সুতো আর মোড়কের কাগজের।

ডাকঘর থেকে সে যখন বেরিয়ে এল, তার চোখ যখন টনটন করছে। রগও দপদপ করছে। যা পরিশ্রম গেল, তাতে তো এমনটা হতেই পারে।

পা দুটো যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে আছে। ধীরে-ধীরে পা ফেলে হাঁটতে লাগল। শহরের যে-অংশটা একটু নির্জন, ফাঁকা, এখন সে সেইখানে যাবে। তার এখন একটু খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়া দরকার।

সন্ধ্যার হাওয়ায় সুস্থ বোধ করল সে। ঘণ্টাখানেক বাদে সে যখন ঘরে ফিরল, তখন তার ক্লান্তি অনেকটাই কেটে গেছে।

পরদিন সকালে মনে হল, ক্লান্তির শেষ রেশটুকুও আর নেই। সে এখন একেবারে টাটকা তাজা একটা মানুষ। ব্রেকফাস্ট করতে-করতে কাগজ পড়ছিল সে। সেই সময়ে সোসাইটি অব ফাইন আর্টসের ছোট্ট একটা বিজ্ঞপ্তি তার চোখে পড়ে। সোসাইটি জানাচ্ছে যে, প্রদর্শনীতে এবারে প্রচুর ছবি এসেছে। এবারকার প্রদর্শনী যে দারুণ সফল হবে, তাতে তাদের সন্দেহ নেই।

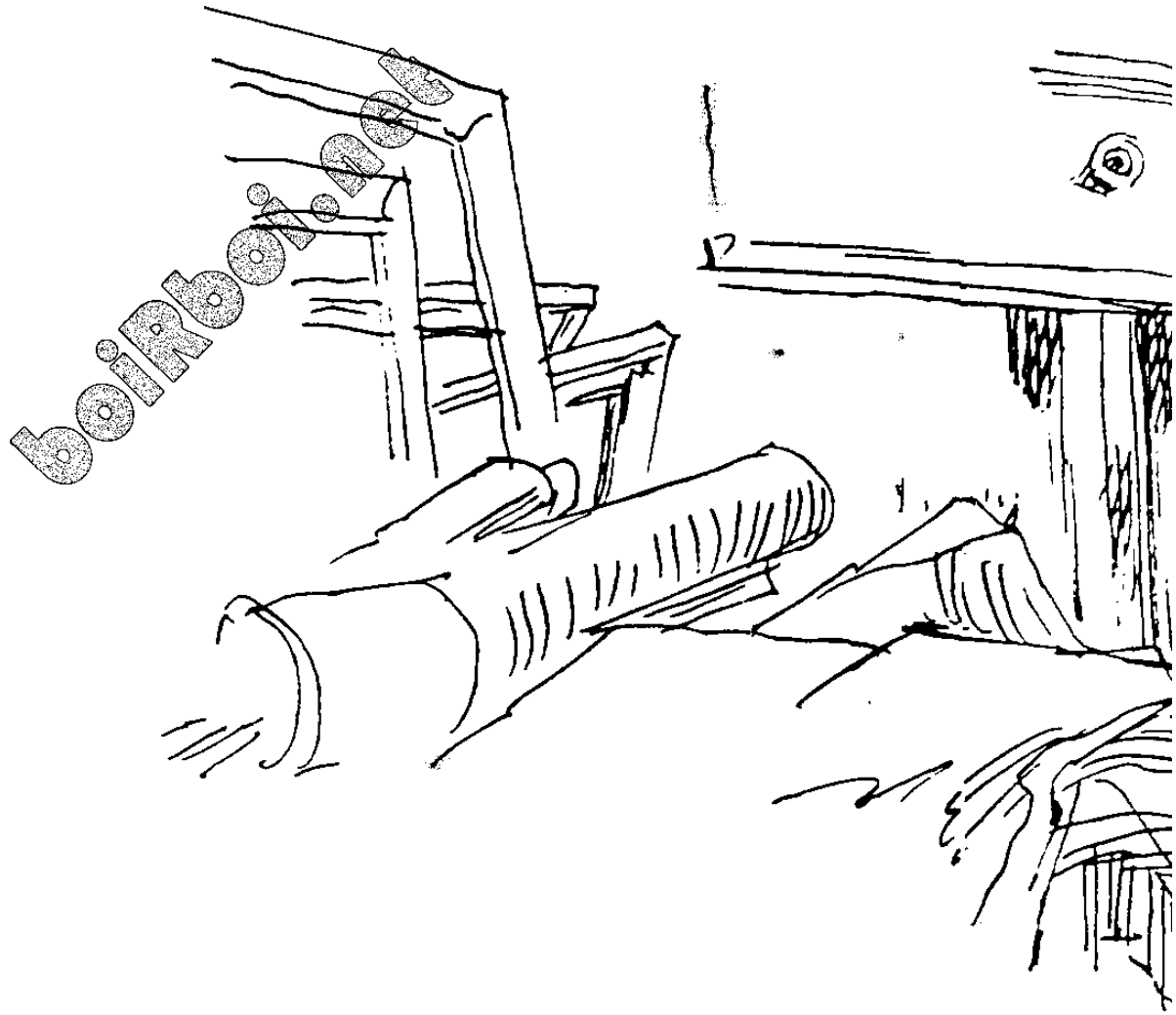
boiRboi.net

একবার তার মনে হল, এবারে স্টুডিয়োটাকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা দরকার। এত জঞ্জাল জমে আছে যে, সে-সব সাফ না-করলেই নয়। তারপরেই আবার আলস্য তাকে পেয়ে বসল। বসে-বসে সে ভাবতে লাগল, উঠবে কি উঠবে না। শেষ পর্যন্ত মনে হল, সাফসুতরোর কাজটা পরে করলেও চলবে।

সেদিন সে যখন ফের তার স্টুডিয়োয় গিয়ে ঢুকল, তখন সন্ধে উতরে গেছে। ঘর অন্ধকার। তারই মধ্যে হাতড়ে-হাতড়ে সে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। স্টুডিয়োটা একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের অগোছালো হয়ে আছে। এখানে-ওখানে পড়ে আছে রঙের টিউব। তুলিগুলোও যে কোনটা কোথায় ছড়িয়ে রয়েছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। তাড়াতাড়ি কাজ করতে হয়েছে তো, তাই যেখানে যেটা রাখার কথা, সেখানে সেটা রাখেনি। মেঝের উপরে ছেঁড়ে ন্যাকড়া আর কাগজের ডাঁই।

স্টুডিয়োর এই বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখতে-দেখতেই হঠাৎ একখানা কাগজের উপরে চোখ পড়ল তার। ইজেলের ঠিক নীচেই কাগজখানা

পড়ে আছে। বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠল। এটা তার চেনা কাগজ। নিচু হয়ে কাগজখানা সে তুলে নিল।

তারপরেই যেন অন্ধকার হয়ে গেল গোটা পৃথিবী। ইজেলটাকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে কোনওমতে সে সামলে নিল। হাতের মধ্যে যে কাগজখানা আঁকড়ে ধরে রয়েছে, সেটা তো সামান্য একখানা কাগজমাত্র নয়, সেটাই যে তার সেরা ছবি—দ্য সমন্যামবুলিস্ট। স্বপনচারিণী। এত পরিশ্রম করে, এত যত্ন নিয়ে যাঁর ছবি সে এঁকেছে, সেই লেডি ম্যাকবেথ এখন তাঁর ঘুমন্ত, ভাষাহীন কাচের মতো চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ওই চোখ দুটিও তো তারই দেওয়া।

বিস্ময়ের প্রাথমিক প্রবল ধাক্কাটা কেটে যেতেই একটা ভয়ঙ্কর হতাশায় সে ডুবে গেল। গণ্ডগোল যে কোথায় হয়েছে, সেটা বুঝতে তার বিশেষ সময় লাগেনি। এবারও তার অন্যমনস্কতাই তাকে ডুবিয়েছে। তার জীবনে এ তো নতুন-কিছু নয়। অতীতেও একাধিকবার এমন ঘটনা ঘটেছে তার জীবনে। তবে কিনা সেই অন্যমনস্কতার পরিণাম বড়জোর

হাসির খোরাক জোগাত, কখনওই এমন সর্বনাশ তার ফলে ঘটেনি।

এবারে সেই সর্বনাশটাই ঘটল। নিদারুণ, নিষ্ঠুর সর্বনাশ।

মনে হল, প্রবল একটা গ্লানি যেন তার ভিতর থেকে উঠে আসছে। সে ভীষণ অসুস্থ বোধ করছে। কমিটির হাতে কী পৌঁছে দিয়েছে সে? পার্সেল খুলে একখানা কাগজ, আর সেইসঙ্গে শিল্পী ও ছবির নাম ছাড়া ত আর কিছুই তারা পায়নি। ছবির বদলে স্রেফ একখানা কাগজ পেয়ে তারা নিশ্চয় হেসে খুন হচ্ছে।

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কীই বা একে বলা যায়। দাঁতে দাঁত ঘষে, নিরুপায় আক্রোশে সে নিজেকে আর তার ভাগ্যকে বারবার ধিক্কার দিতে লাগল।

ছবিখানাকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল সে। ছেঁড়া টুকরোগুলোকে নিক্ষেপ করল বাজে-কাগজের ঝুড়ির মধ্যে।

পরের সপ্তাহে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল এই বিপর্যয়ের কথা ভুলে যেতে। ভুলে যাবার জন্যে রং আর তুলি দিয়ে এমন সমস্ত কাজ করতে লাগল, যে-ধরনের কাজ সে এর আগে কখনও করেনি। আসলে এ ত আর কিছুই নয়, নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা। সে যখন এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আর বিপর্যয়ের ব্যাপারটা সত্যিই ভুলতে বসেছে, ঠিক তখনই, পনরোই জানুয়ারির—অর্থাৎ প্রদর্শনীর যে-দিন উদ্বোধন হবে, সেই দিনটিরই—সকালে একখানা চিঠি তার কাছে এসে পৌঁছল। সে তার ব্রেকফাস্ট সেরে নিচ্ছে, এই সময় চিঠিখানা সে হাতে পায়। নীল রঙের লম্বাটে খাম। তার উপরে পরিচ্ছন্ন প্রতীক। কারা এ-চিঠি পাঠিয়েছে, তা ওই প্রতীক দেখেই বোঝা যায়। চিঠি পাঠিয়েছে সোসাইটি অব ফাইন আর্টস।

খাম খুলে চিঠি বার করবার আগে এক মুহূর্ত সে ভাবল যে, চিঠিতে কী থাকতে পারে। তার মনে হল, 'রহস্যজনক' পার্সেলটি সম্পর্কে সোসাইটি নিশ্চয়ই কিছু জানতে চাইছে। সম্ভবত এটা নিয়মরক্ষার ব্যাপার মাত্র, সোসাইটি যা হামেশা করে থাকে।

স্থিরভাবে খামের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চিঠিখানা সে বার করে আনল।

চিঠির সূচনা এইরকম: "প্রিয় মহাশয়, আমরা আপনাকে সানন্দ অভিনন্দন জানাই..." কিন্তু এ তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার! নিজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সংক্ষেপে, আধা-আনুষ্ঠানিক ভাষায়, সোসাইটি তাকে জানাচ্ছে যে, তার ছবি 'দ্য সমন্যামবুলিস্ট' এবার একটি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। চিঠির উপসংহারে রয়েছে সনির্বন্ধ অনুরোধ,

প্রদর্শনীর উদ্বোধন-দিবসের অনুষ্ঠানে তার উপস্থিত থাকা চাই।

তার মাথা ঘুরছিল। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। খুশি হবে কী, সে বিভ্রান্ত বোধ করছিল। প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে যাবার পর সে বুঝতে পারল যে, কোথাও কিছু-একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। নয়তো এমন হয় না, এমন হতে পারে না।

আধ ঘণ্টা বাদে সে যখন টাউন হলে গিয়ে পৌঁছল, নিরুদ্ধ উত্তেজনায় তখন তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।

টাউন হলের মস্ত ফটক সর্বসাধারণের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রদর্শনী দেখবার জন্যে লোক আসছে লাইন বেঁধে। অকারণে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে দুই বিপুলকায় শিল্প-বোদ্ধা। তাঁদের ঠেলেঠুলে কোনওরকমে সে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

প্রদর্শনী দোতলায়। সিঁড়িতে চমৎকার গালচে পাতা। তার উপর দিয়ে এক-এক বারে তিন ধাপ করে সিঁড়ি টপকে সে দোতলায় গিয়ে পৌঁছল।

যে-হলে প্রদর্শনী, রঙের বাহারে সেটা ঝলমল করছে। চার দেওয়াল জুড়ে নানা আকারের অসংখ্য ছবি। তার মধ্যে যেমন আছে ছোট্ট-ছোট্ট সব মিনিয়েচার, তেমন আছে বিশাল সব ক্যানভাস।

উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে ধকধক করছে, ঘুরে-ঘুরে সে ছবি দেখতে লাগল। যে-সব ছবি পুরস্কার পেয়েছে, তার প্রতিটির তলায় পরিচ্ছন্ন একটি লেবেল আঁটা। তাতে শিল্পী আর ছবির নাম। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সেই লেবেলগুলো দেখে যাচ্ছে সে।

উত্তর, পুব আর দক্ষিণের দেওয়াল শেষ করতে তার পুরো একটি ঘণ্টা লেগেছে। ল্যান্ডস্কেপ, ফিগার, স্টিল লাইফ, নানান মাধ্যমে করা স্কেচ, কোনওটাই সে বাদ দেয়নি। এ যেন তার দৃষ্টিশক্তির অগ্নিপরীক্ষা। চোখ লাল, ব্যথাও করছে। কিন্তু তা হোক, রহস্যের সমাধান না-করে সে ছাড়বে না।

সে যখন পশ্চিমের দেওয়ালে গিয়ে দাঁড়াল, তখন তার উৎসাহ অবশ্য অনেকটাই ঝিমিয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখল, তাতে তার উৎসাহের যেটুকু যাও বা অবশিষ্ট ছিল, তাও তার আর রইল না। দেওয়াল জুড়ে ঝুলছে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো সব ছবি, যার নাম কিনা অ্যাবস্ট্র্যাকশন বা বিমূর্ত শিল্প!

প্রথম ছবিটাই প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। নেহাতই অনিচ্ছায়, প্রায় যন্ত্রের মতো সে ছবিখানার লেবেলের উপরে চোখ রাখল।

নামটা চেনা-চেনা মনে হল। আরে, এ তো তারই নাম! আর ছবির

নাম ? ওটাও তার চেনা—'দ্য সমন্যামবুলিস্ট' ।

কিন্তু এটা কীসের ছবি ? তুলি দিয়ে এই যে রং-বেরঙের ছোপ লাগানো হয়েছে, এরই বা অর্থ কী ? এ-রকম কিছু তো সে কস্মিনকালেও আঁকেনি ।

একেবারে বিদ্যুচ্চমকের মতোই ব্যাপারটা সে বুঝে গেল । ছবি নয়, এটা সেই কাগজখানা, ছবিতে যে-যে রং ব্যবহার করবে, তার মিশেল ঠিক করবার আগে এরই উপরে সে তার তুলি দিয়ে হরেক রঙের ছোপ লাগিয়েছিল ।